আগস্ট ২০২৪ ❑ ২০ টাকা

বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থান

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪— অন্তর্বস্তু বিচার ❑ সাম্রাজ্যবাদী শোষণে সুদান সর্বস্বান্ত

রক্তস্নাত বস্তার ❑ ভারতে বৈষম্য— শতবছরের চালচিত্র

স্মরণঃ সিদ্ধার্থ গুহ রায়

গ্রন্থ পর্যালোচনাঃ জোহার ও দল্লী-রাজহরার ডায়েরি

শিক্ষার্থী-জনতার গণঅভ্যুত্থানে হাসিনার স্বৈরশাসন উৎখাত

ওমর তারেক চৌধুরী

১

বাংলাদেশের শিক্ষার্থী-জনতা নানা বৈশিষ্ট্যে অভূতপূর্ব এক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ৫৩ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও নজিরবিহীন নিপীড়ক শাসকগোষ্ঠী, পরপর তিনটি নির্বাচন ছিনতাই করে ক্ষমতা দখলকারী, আওয়ামী লীগকে সফলভাবে গদিচ্যুত করেছেন গত ৫ অগাস্ট।

দেড় যুগ ধরে কর্তৃত্ববাদী শাসন পরিচালনার খলনায়িকা অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবনের ফটকে আক্ষরিক অর্থে নিরস্ত্র জনতার জোয়ার আছড়ে পড়ার ঘন্টাখানেক আগে তিনি পদত্যাগপত্রে সই করে তড়িঘড়ি করে বিমানে চড়ে ভারতে পলায়ন করেন। তার পলায়নের মাধ্যমে অবসান ঘটে গত ১৫ বছরে চালানো দমনপীড়ন, গুমখুন, জেলজুলুমের নৃশংস স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর শাসনের। হাঁফ ছেড়ে বাঁচা বিজয়ী জনতার মুখে মুখে রটতে থাকে: 'হাসিনা পলাইছে!'; অনেকে বলা শুরু করেন: 'এটা বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা' লাভ!

পলায়ন কালে তার সঙ্গী হন আগের দিন লন্ডন থেকে আগত তার ভগিনী শেখ রেহানা। ক্ষমতা ছাড়ার অন্তিম কালের সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ বাংলাদেশ ও ভারতের সংবাদ মাধ্যম, বিবিসি (সেগুলোও বাংলাদেশের প্রথম আলোর সূত্রে) এবং রয়টার্সের বয়ানে (এখানে ভিন্ন কিছু তথ্য ও সূত্র রয়েছে) জানা যায়। স্বাভাবিকভাবে অনুমান করা যায় পলায়ন-পর্বের নেপথ্যের অনেক বিবরণ এখনও জনসমক্ষে আসেনি। আদৌ কবে জানা যাবে বলা মুশকিল। দূর থেকে তোলা সূত্র বিহীন একটি মাত্র লভ্য আবছা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, হেলিকপ্টারের পাশে সেডান কার ও বিলাসবহুল জিপ, শেখ হাসিনা, বেশ কিছু সামরিক নিরাপত্তা কর্মী এবং এক পাশে গোটা পাঁচেক বড় আকারের স্যুটকেস। যদিও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে তিনি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র ছাড়া এক কাপড়ে রওনা দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো তাহলে অতগুলো স্যুটকেস কখন গোছানো হলো এবং তার মধ্যে কী রয়েছে? সঙ্গে শুধু বোনের কথা বলা হলেও ইন্ডিয়া টুডে নামোল্লেখ না করে বলেছে শেখ হাসিনার 'টিম মেম্বারস' দিল্লী ছেড়ে চলে গেছেন। অপ্রাতিষ্ঠানিক সূত্র থেকে জানা গেছে তাকে আগরতলা থেকে নিয়ে যাবার জন্য বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর যে বিমানটি আগেই সেখানে পাঠানো হয়েছিল, তাতে 'টিম মেম্বারস' ছিলেন। তাতে বোঝা যায়, তিনি শুধু বোনকে নিয়ে পালাননি; তার সাথে ঘনিষ্ঠ কিছু সহচরও পালিয়েছে; যাদের সম্পর্কে বাংলাদেশ বা ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নীরবতা পালন করছে।

এ সময়ের মূল কথা হলো: হাসিনা তখনও ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ ছিলেন এবং ছাত্র-জনতার দেশব্যাপী প্রচণ্ড আন্দোলনকে আরও প্রবল শক্তি প্রয়োগ করে দমনের জন্য পুলিশ, বিশেষত সামরিক বাহিনীর উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করেন। পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করে সামরিক বাহিনী কিছু করছে না বলে অভিযোগ করেন। কিন্তু সামরিক বাহিনী তাকে সবিনয়ে জানিয়ে দেয় জনতার বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী ব্যবস্থা নিতে অপারগ (এটা আগের দিনেই সামরিক বাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ের অফিসারদের অভ্যন্তরীণ সভার অভিমত); তারা খুব জোর পুলিশকে সহায়তা করতে পারে। ক্ষমতা না ছাড়া নিয়ে গোয়ার্তুমির মুখে সামরিক বাহিনী তাকে অবহিত করে জনতার ঢল তার বাসভবনের ফটকে ৪৫ মিনিট থেকে এক ঘন্টার মধ্যে এসে পৌঁছাবে, যা ঠেকানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। তিনি পদত্যাগপত্র সই করেন, পলায়নের ব্যবস্থা নিয়ে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বাসভবনের অদূরেই একটি এয়ারফিল্ডে নেমে হেলিকপ্টারে আগরতলা হয়ে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের হিন্দন বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করেন।

পলায়নের দুই সপ্তাহ আগে, আন্দোলন চলাকালে, ২২ জুলাই শেখ হাসিনা যথেষ্ট দম্ভ ও আত্মশ্লাঘার সাথে বলেছিলেন 'শেখ হাসিনা পালায় না।' কিন্ত সিংহাসন ও রাজ্যপাট ছেড়ে পলায়নের ক্ষেত্রে রাজা লক্ষ্মণ সেনের পর তিনি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। লক্ষ্মণ সেন পালিয়েছিলেন অশ্বারোহী বৈদেশিক আক্রমণকারীদের ভয়ে আর হাসিনা পালালেন আক্ষরিকভাবে লাখ লাখ নিরস্ত্র জনতার মিছিলের ত্রাসে; যাদের কারো হাতে কোনো প্রাণঘাতী অস্ত্র ছিল না। এর পূর্বে আরো দুটি গণঅভ্যুত্থানে, ১৯৬৯ ও ১৯৯০ সালে, উৎখাত হওয়া সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল আইয়ুব খান ও জেনারেল এরশাদও দেশ ছেড়ে পালাননি। বরং যে কারণেই হোক কারাবন্দী এরশাদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে রাজনীতিতে ফিরে এসেছিলেন।

২

এই অভ্যুত্থানের মূলে রয়েছে সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ বা কোটা সংস্কারের দাবি। ইত্যবসরে এ বিষয়ে অনেকেই সাধারণ ধারণা অর্জন করে থাকবেন হয়তো। বিভিন্ন সময়ে নানা আকারে চলে আসা আন্দোলনের এই পর্বটি সর্বশেষ দ্বিতীয় পর্ব। আগের পর্বটি সংঘটিত হয়েছিল ২০১৮ সালে; সে সময়ে একটি বড় মোড় নিয়েছিল আন্দোলনটি। আন্দোলনের মুখে 'বিরক্ত' হয়ে হাসিনা নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কোটা ব্যবস্থাকে উঠিয়ে দিয়েছিলেন। কোটা বিলোপ করার পরে (আন্দোলনকারীরা কখনওই বিলোপ চায়নি, চেয়েছিল সংস্কার) দুই ধরনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দলের দুটি পৃথক মামলায় দুই ধরনের রায় হয়। সর্বশেষ রায়ে উচ্চ আদালত কোটা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ পূর্বাবস্থায় বহাল করে দেয় এ বছরের ৫ জুন। এই রায় কোটা আন্দোলনকে 'ফির পহেলে সে' অবস্থায় ঠেলে দেয়—অর্থাৎ, 'মুক্তিযোদ্ধা কোটা' নামে সকল চাকরির ৩০% শুধু একটি বর্গর তৃতীয়/চতুর্থ প্রজন্মর জন্য সংরক্ষণসহ মোট চাকরির ৫৬% (মুক্তিযোদ্ধা, জেলা, নারী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী— এই পাঁচটি বর্গর জন্য) সংরক্ষণের মধ্যে নিয়ে আসে আবার। সংরক্ষণের বাইরে মাত্র ৪৪% চাকরির সুযোগ লভ্য থাকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য— যা 'মেধা কোটা' নামে পরিচিত।

ত্রিশ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটার জন্য স্বাভাবিক নিয়মে উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া ক্রমশ কমে আসতে থাকে ১৯৯০ সালের দিকে। তখন শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে প্রথমে এই কোটাটি মুক্তিযোদ্ধদের দ্বিতীয় প্রজন্ম— সন্তানাদি— এবং ২০১১ সালে এসে তৃতীয় প্রজন্মর জন্য— নাতিপুতি— প্রযোজ্য করেন।

এই অযৌক্তিক সম্প্রসারণের কারণটি যে অনুগত ভোট ব্যাংক তৈরি করা তা নিয়ে সন্দিহান হবার খুব বেশি অবকাশ নেই। অন্যদিকে, সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তার সাথে তাল মিলিয়ে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা বৃদ্ধি, চাকরির লভ্যতা হ্রাস (বর্তমানে পাঁচ লক্ষ শূন্য পদ থাকলেও কোনো নিয়োগ দেয়া হচ্ছে নানা গড়িমসিতে), সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস (একেকটি পরীক্ষার ফাঁস হওয়া প্রশ্ন ৬-৮ লাখ টাকায় বিক্রি হয়), তদবির, দুর্নীতি, আওয়ামী লীগের প্রতি আনুগত্য যাচাইয়ের জন্য বিগত দুই/তিন পুরুষের ইতিহাস নিয়ে পুলিশি অনুসন্ধান, প্রভৃতি মিলিয়ে পুরো পরিস্থিতি চাকরি ক্ষেত্রে প্রবেশেচ্ছুদের জন্য চরম হতাশাজনক হয়ে ওঠে ও সঙ্গত ক্ষোভের সঞ্চার করে। আর বিগত দেড় যুগে যেকোনো বিরোধী মত ও সমালোচনা, ন্যায়সঙ্গত দাবি ও ক্ষোভকে দমনের চরম হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল সবকিছুকে 'জামাত-শিবির-বিএনপি', 'স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি', 'রাজাকার' ইত্যাদি বলে দাগিয়ে দেয়া। ২০১৮ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলন শক্তভাবে সংগঠিত হবার কারণে হাসিনার রাগবশত কোটাকে সম্পূর্ণভাবে উঠিয়ে দেবার সময় জাতীয় সংসদে আলোচনায় আওয়ামী লীগের মতিয়া চৌধুরী (ষাটের দশকের বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের নেত্রী) আন্দোলনকারীদেরকে 'রাজাকারের বাচ্চা' বলে গালি দেন! এটা ছিল বিরোধীদের উপর আওয়ামী ফ্যাসিবাদের মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণের একটি নিখাদ দৃষ্টান্ত।

৩

৫ জুন আদালতের রায়ের মাধ্যমে ৫৬% কোটা পূর্বাবস্থায় ফিরে এলে কোটা আন্দোলনের সর্বশেষ পর্বটি—বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন নামে পরিচিতি— শুরু হয় ১ জুলাই থেকে। সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল এবং আপিল প্রক্রিয়াটি সময় সাপেক্ষ ছিল; আন্দোলনকারীদেরকে ভোগাতে সরকার উদ্যোগী হতে তৎপর ছিল না। আর আন্দোলনকারীরা চাইছিল সরকার যাতে নির্বাহী আদেশে আদালতের রায়ের বিপরীতে অবস্থান নেয়। তারা নিয়মিতভাবে শান্তিপূর্ণ পন্থায় তাদের দাবি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন সরকারের উপর চাপ তৈরি করতে। কর্ম দিবসগুলোতে তারা রাস্তা আটকে নির্দিষ্ট সময় সমাবেশ বিক্ষোভ করে চলে যেত। জুলাইয়ের ১০ থেকে ১২ তারিখ তারা বাংলা ব্লকেড নামে কর্মসূচি দিয়ে আন্তঃশহর সড়ক ও রেলপথ অবরোধ শুরু করে। ক্রমাগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের যোগদানের মাধ্যমে আন্দোলনকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। চীন সফর থেকে ফেরা প্রধানমন্ত্রী ১৪ জুলাই বিকালে তার মজলিশি মেজাজের সাংবাদিক সম্মেলনে আন্দোলনকারীদের ইঙ্গিত করে 'রাজাকার' তীরটি ছুড়ে দেন: 'মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর তাদের এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-নাতনিরা কোটার সুবিধা পাবে, নাকি রাজাকারদের নাতি-নাতনিরা পাবে!' সেদিনই রাতে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ক্ষুব্ধ ও অপমানিত ছাত্রছাত্রীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস মুখর হয়ে ওঠে প্রতিবাদে। আবাসিক হলের ফটক ভেঙে তারা দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে আসে— "তুমি কে আমি কে? রাজাকার রাজাকার! কে বলেছে কে বলেছে? স্বৈরাচার স্বৈরাচার!' এবং 'চাইতে গেলাম অধিকার হয়ে গেলাম রাজাকার!' প্রভৃতি স্লোগান তুলে। মধ্যরাতেই এই বিক্ষোভ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য

আবাসিক হল থেকে শুরু করে সারা দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে। সম্ভবত এটি একটি মোড় ঘোরানো ঘটনা ছিল। এই প্রথম যত্রতত্র 'রাজকার' গালির প্রকাশ্য উপযুক্ত উত্তর আন্দোলনকারী সরবে দিল প্রধানমন্ত্রীর দিকে সরাসরি আঙুল তুলে। প্রতিটি ক্যাম্পস যেখানে এক অর্থে আওয়ামী ছাত্র সংগঠনের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প, সেখানে এই ঘটনা একটি দুঃসাহস ও চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। পর দিন দুপুরের পরে আন্দোলনকারীরা প্রতিবাদ সভার ডাক দেয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের নির্জলা ভাষার এই প্রতিবাদ আওয়ামী লীগ এবং তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমর্থক বলয়ে 'রাজাকার' মিথ ভেঙে ফেলার তীব্র অপমানের জ্বালা ধরিয়ে দেয়, এবং চূড়ান্ত বিচারে শেখ হাসিনার জন্য বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায় অপমানজনক বিদ্রুপটি। সর্বক্ষণ বাচাল ও স্থূল প্রকৃতির খেলো কথার জন্য সুপরিচিতি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সংবাদিকদের বলেন, যারা নিজেদের রাজাকার বলে পরিচয় দেয় আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগ তাদের মোক্ষম জবাব দেবে। ওই দিন দুপুরেই আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ ও যুবলীগ এবং সন্নিহিত এলাকার লুম্পেন গুন্ডারা আন্দোলনকারী ছেলে ও মেয়েদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঠি, বাঁশ, রড, পাইপ, ক্রিকেটের স্ট্যাম্প ও হকিস্টিক নিয়ে। সারা ক্যাম্পাস জুড়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আন্দোলনকারীদের একতরফা বেদম প্রহার করা হয়। তিন শতাধিক আন্দোলনকারী আহত হয়। হাসপাতালে ঢুকে আহতদের দ্বিতীয় দফা পেটানো হয় এবং তাদের চিকিৎসা না দেবার জন্য চিকিৎসকদের উপর জবরদস্তি চালায়। দুই সপ্তাহ ধরে চলা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ একটি আন্দোলনে এই প্রথম অবর্ণনীয় সহিংসতা দেখা দেয় এবং তার সূচনা ঘটে সরকারে মন্ত্রীর প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে।

১৬ জুলাই থেকে ঘটনাবলিতে নতুন দিক সংযোজিত হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুরে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। রংপুরের রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারের বিপরীতে আন্দোলনের আঞ্চরিক সমন্বয়ক আবু সাঈদ প্ররোচনাহীনভাবে রাস্তার অপর পারে দুই হাত মেলে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পুলিশ কাছ থেকে সরাসরি তার শরীরের উপরাংশ লক্ষ্য করে একদিকবার শট গান থেকে গুলি ছুড়লে সাঈদ মারা যান। এ ঘটনা সারা দেশসহ বিশ্বকে নাড়া দেয়। শহীদ আবু সাঈদ একই সাথে পুলিশি নৃশংসতা ও উদ্দীপনাময় সাহসের প্রতীক হয়ে ওঠেন সারা দেশে। এদিন কমপক্ষে ছয়জন নিহত হয়।

পুলিশি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্রলীগকে ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের কক্ষ তছনছ-ভাঙচুর এবং নেতাদের মোটর বাইকে অগ্নিসংযোগ করে। সকল ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রলীগকে উৎখাত করার বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ছিল দুই কারণে: ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে গুন্ডা দিয়ে আন্দোলন প্রতিরোধে সরকারের শক্তি খর্ব করা এবং গুন্ডাবাহিনীর মনোবল ভেঙে দেওয়া। দুটিই কার্যত সফল হয়েছিল; শেষ দিনেও ওরা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি।

ছাত্র আন্দোলনের উপর সরকারি গুন্ডাবাহিনীর আক্রমণ ও পুলিশের প্রবল বলপ্রয়োগের ঘটনাবলিতে সকল রাজনৈতিক দল ছাত্রদের আন্দোলনের প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন ব্যক্ত করে, যা ছিল প্রকারন্তরে আন্দোলনে তাদের সরাসরি অংশ নেওয়ার ঘোষণা। এভাবে কোটা পদ্ধতির দাবির সঙ্গে একই স্রোতে মিলে যায় সর্বসাধারণের বুকে চেপে থাকা ক্ষোভের আগুন।

১৭ জুলাই ছাত্ররা নিহতদের জন্য 'গায়েবি জানাজা' পড়ার চেষ্টা করে কিন্তু পুলিশ ঢাকা, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের জানাজার সমাবেশে হামলা চালায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস বন্ধ করে দেয় এবং ছাত্রদের আবাসিক হল খালি করার নির্দেশ দেয়া হয়। ছাত্রদের তুমুল অনীহার মুখে সাউন্ড গ্রেনেড-কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে জোরপূর্বক হলগুলোকে খালি করায়।

শোকে আকুল শেখ হাসিনা কালো শাড়ি পরে টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রাণহানির জন্য দুঃখ প্রকাশ, দোষীদের জবাবদিহিতায় আনতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ের (যা ৭ আগস্ট দেওয়ার কথা ছিল) জন্য অপেক্ষা করার আহ্বান জানান আন্দোলনকারীদের প্রতি।

পূর্বের সব প্রতারণার তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে টিভি ভাষণ মানুষকে ভোলাতে পারেনি। ১৮ তারিখ থেকে আন্দোলনের প্রচণ্ডতা ও পুলিশি হত্যার সংখ্যা তাপমানযন্ত্রর পারদের মতো উপরে উঠতে থাকে। মৃত্যুর সংখ্যা এদিন ছিল ২৯, ১৯ তারিখে ৬৬ জন। গুরুত্বপূর্ণ একটি এক্সপ্রেসওয়ের টোল প্লাজা পুড়িয়ে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়কটিসহ আশেপাশের মানুষ টানা চারদিনের বেশি বিরামহীনভাবে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ অব্যাহত রাখে। যাত্রাবাড়ি-শনির আখড়া-রায়েরবাগ নামক ওই অঞ্চলটি প্রচুর প্রাণহানির মুখেও শেষ সময় পর্যন্ত আন্দোলনের পক্ষে লড়াকু ভূমিকা অব্যাহত রাখে। পুলিশকে সহায়তা দেওয়া ও

জনসাধারণকে ভীত করার উদ্দেশ্যে আধা-সামরিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-কে নামানো হয় আন্দোলনে অধিক সক্রিয় ও বড় শহরগুলোতে। পরবর্তী দিনগুলোতে মৃতের সংখ্যা লাফে লাফে বাড়তে থাকে; *ডেইলি স্টার* পত্রিকার নিজস্ব হিসেবে ২৩ তারিখে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪৬। *প্রথম আলো*-র হিসেবে ২৫ জুলাই: ২০১, পরদিন বেড়ে ২০৪, ২৭ তারিখে বেড়ে ২০৯ (সরকারি মিথ্যা হিসেবে ১৪৭)। হাসিনা পালিয়ে যাবার আগের দিনটিতেই নিহত হয় ১০৮ জন।৩৩৩

সমকাল পত্রিকার হিসেবে ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে গত ১৬ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত সংঘাত-সহিংসতায় ৩৩১ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আর ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর থেকে আজ পর্যন্ত ২৪৮ জন মারা গেছেন। এ নিয়ে গত ২৬ দিনে সারা দেশে মোট ৫৭৯ জন নিহত হয়েছেন। ইউনিসেফের প্রাতিষ্ঠানিক হিসেবে ২০ দিনের সংঘর্ষে ৩২টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, সবই পুলিশ অথবা সরকারি গুণ্ডাবাহিনীর গুলিতে। তিনটি সংবাদ শিরোনাম: 'বাসার ছাদে বাবার কোলে ঢলে পড়ে [বুলেটবিদ্ধ হয়ে] ছোট্ট মেয়েটি', 'বারান্দায় দাঁড়ানে আহাদের ডান চোখে লাগে গুলি', 'ছেলের লাশেও গুলি লাগে, বললেন বাবা'।

৪

মৃত্যুর পাশাপাশি সহিংসতার অন্য রূপগুলোও বাড়তে থাকে: জেল ভেঙে অস্ত্র-গোলাগুলিসহ বন্দিদের ছাড়িয়ে নেয়া (জেলা শহর নরসিংদিতে এমন ঘটনা প্রথম শুরু হয়। ৯০০ বন্দি, ৮০টি আগ্নেয়াস্ত্র, হাজার রাউন্ড গুলি নিয়ে পলাতক) যা হাসিনার পালিয়ে যাবার পরেও অব্যাহত রয়েছে। জেল থেকে বন্দি পালানো/মুক্ত করা, দাঙ্গা, গুলিবর্ষণ, সংঘর্ষে মৃত্যু প্রভৃতি প্রসঙ্গে লেখকের নিজস্ব একটি ব্যাখ্যা হলো: আওয়ামী জমানার ১৬ বছরে বাংলাদেশের প্রতিটি কারাগার তার ধারণ ক্ষমতা তিন থেকে চারগুণ বন্দিতে ভরপুর— এদের অধিকাংশই হলো প্রধানত বিএনপি ও তারপর জামাতে ইসলামের নেতা কর্মী। একেকটি 'গায়েবী মামলা'য় (এই জমানায় সৃষ্ট নতুন পরিভাষা—ভিত্তিহীন মিথ্যা মামলা) শত শত থেকে সহস্র বিরোধী দলীয় কর্মীদের আটকে রাখা হয়েছে মাথাপিছু অসংখ্য গুরুতর মামলা দিয়ে। নিম্ন আয়ের একেকটি পরিবার নিঃস্ব হয়ে উঠছে পরিবারের আটক সদস্যদের নিয়ে থানা, আদালত, জেলখানায় ছোটাছুটিতে। বিএনপির নেতৃস্থানীয়দের কারো কারো মাথায় ঝুলছে শতাধিক করে মামলা। দেশের একটি বড় অংশ বন্দিদের ছুটিয়ে আনতে যেমন ব্যাকুল তেমনি কারাগারের ভেতরে আটকে থাকা বন্দিও বেরিয়ে আসার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে এই অস্থির সময়ে। এর থেকেই উদ্ভূত হচ্ছে কারাগার নিয়ে অস্থিরতা ও শৃঙ্খলা ভঙ্গর ঘটনাবলি। তথাকথিত আইনি প্রক্রিয়ায় কবে ছাড়া পাবে তার যখন নিশ্চয়তা নেই, তখন আইন ভেঙ্গে মুক্ত হওয়াই সহজ পথ হয়ে উঠেছে।

৫

ষোল বছরের স্বৈরশাসনে বৃহদাংশ, সকল শাখাসহ পুলিশ এবং অনেকাংশে র‍্যাব সকল ধরনের সরকারি দমনপীড়নের সার্বক্ষণিক হাতিয়ার হিসেবে ভূমিকা পালন করে এসেছে। পুলিশ বাহিনীকে পরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ইত্যাদির কর্মী দিয়ে। সকল ক্ষেত্রে এদেরকে যেন বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে গড়া হয়েছে একেকটি দানব হিসেবে। একেকটি থানা গড়ে উঠেছিল একেকটি জুলুমখানা হিসেবে; রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তো বটেই সাধারণ মানুষকে এরা যেভাবে জুলুম করেছে— ছোটখাট ঘটনা বা কল্পিত ঘটনায় আটকদের উপর নির্মম শারীরিক নিপীড়ন করে দরিদ্র মানুষদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। বেআইনি আচরণে অভ্যস্ততা, হিংস্রতা, নির্দয়তার চরম সব দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের মানুষ ২০ দিন ধরে প্রত্যক্ষ করল সারা দেশের ঘটনাবলিতে। পত্রিকার কয়েকটি শিরোনাম নির্মম পাশবিক হিংস্রতা সম্পর্কে কিছু ধারণা দিতে পারে হয়তো: 'পেটে গুলি, বুকে গুলি, পায়ে গুলি, কাতরাচ্ছেন তাঁরা', *প্রথম আলো* ১৭৫টি মৃত্যুর তথ্য বিশ্লেষণ করে লিখেছে 'নিহত ৭৮ শতাংশে শরীরে প্রাণঘাতী গুলির ক্ষত', 'সংঘাতের ঘটনায় ৩০৩ জনের চোখে অস্ত্রোপচার' [মানবজমিন]। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুলি করা হয় মাথা লক্ষ্য করে। এত স্বল্প সময়ে এত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা (১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ব্যতীত) পাকিস্তান আমল থেকে এই গণহত্যার পূর্বে বাংলাদেশে কখনও দেখা যায়নি।

৬

প্রতিবেদনের শুরুতেই বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের বা গণঅভ্যুত্থানের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু: প্রতিটি পর্বেই এই আন্দোলনটি গড়ে উঠেছে প্রথাগত, স্বীকৃত ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংযুক্ত ছাত্র সংগঠনগুলোর বাইরে থেকে একেবারে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে। বিপরীত দিকে, প্রথাগত ও স্বীকৃত ছাত্র সংগঠনগুলো কোটা পদ্ধতির বৈষম্যমূলক ও বিপুলসংখ্যক চাকুরি-প্রার্থীদের স্বার্থহানিকর ব্যবস্থাটির প্রতি কোনো নজর দিতে, উদ্যোগ নিতে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা রেখেছে; পর্যবেক্ষণটি তাদের মূল রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আন্দোলনটির কাঠামোগত দিকও

লক্ষণীয়। দেশজুড়ে নানা জায়গায় গড়ে ওঠা শিক্ষার্থীদের একটি নেটওয়ার্ক বা জোট হিসেবে কাজ করেছে; এর নেতৃত্বে রয়েছে শতাধিক 'সমন্বয়ক'। এদের প্রত্যুৎপন্নমতিতা প্রাজ্ঞতা ও নির্ভিকতাও প্রশংনীয়। এরা বহু সরকারি চক্রান্ত ও ফাঁদের জবাব দিয়েছে খোদ শেখ মুজিবর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের হুবহু ভাষা ব্যবহার করে ('শহীদের রক্ত মাড়িয়ে কোনো আলোচনায় বসতে পারি না। নির্দেশ দেবার জন্য আমরা যদি নাও থাকি, তোমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবে।)

৭

হাসিনার পলায়নের লজ্জাজনক ও নাটকীয় ঘটনাটি জানাজানি হবার পর আসলেই ৪৫ মিনিট থেকে এক ঘন্টার মধ্যে জনতার ঢল নামে গণভবন নামে তার সরকারি বাসভবনে। তারপর ঢাকাসহ সারা দেশজুড়ে যা ঘটল তা ছিল পাকিস্তানের কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজের বিখ্যাত কবিতা 'হাম দেখেঙ্গে'-র একটি নিখাদ বাস্তবগ্রাহ্য দৃশ্যাবলির চলচ্চিত্রায়ন তুল্য ঘটনা।

আমরা দেখবই
নিশ্চয় আমরা দেখবই।
আমাদেরকে যে দিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে
তা ভাগ্যলিপিতে লেখা রয়েছে। আমরা দেখবই।
আমরাও তা দেখব।
যখন জুলুম আর নির্মমতার পর্বত
তুলোর মতো উড়ে যাবে
আমরা দেখব।
আমাদের মতো শাসিতের পায়ের তলে
মাটি বুকের মতো ধড়ফড় করবে।
আর আমাদের শাসকের মাথার উপর
বজ্রনিনাদ করবে।
(অনবদ্য কবিতাটির আংশিক আনাড়ি অনুবাদ মার্জনীয়)

আগস্ট মাসের ৫ তারিখে স্বৈরশাসকের নিপীড়ন আর দম্ভর সকল স্মারক আর কীর্তি, ক্ষমতার সিংহাসন আর মাথার মুকুট গুড়িয়ে পড়া শুরু করল, পেঁজা তুলোর মতো সব উড়ে গেল নিমেষে। বাংলাদেশের মানুষের পায়ের নিচে। রক্ত-ঘাম আর জীবনের বিনিময়ে তারা এই প্রতিশ্রুতিই আদায় করে এনেছিল যে, তারা দেখবে! তারা অবশ্যই দেখবে!!

পুনশ্চ : ছোট নিবন্ধটিতে এক বিশাল ঐতিহাসিক ঘটনার একটি বুড়ি ছুঁয়ে যাওয়া বিবরণ দেয়া হলো। স্বাভাবিকভাবে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্যা এখানে ধারণ করা যায়নি। এবং ৫ অগাস্টের পরে আরো কী কী ঘটল তা এখানে অনুল্লিখিত রয়ে গেল। পরে সেগুলি বলার চেষ্টা করা যেতে পারে। ❑

সাম্প্রদায়িকতা নয়, সাম্রাজ্যবাদী লুটপাট ও সম্পদের কেন্দ্রীভবন বাংলাদেশের মূল সমস্যা

...বাংলাদেশ নিয়ে গড়পড়তা ভারতীয়দের ধারণা সংকীর্ণ। এর জন্য আমি ভারতের মূলধারার মিডিয়াকে দায়ী করব। কেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বর্তমানে ভারত রাষ্ট্রের প্রতি বিক্ষুব্ধ, সেই সংক্রান্ত আলোচনা ভারতীয় মিডিয়ায় আসে না। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয়রা বিষয়গুলি জানতেই পারেন না। অনেকেই মনে করেন বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা সাম্প্রদায়িকতা। নিশ্চয় সাম্প্রদায়িকতা একটি বড় সমস্যা। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী লুঠপাট, সম্পদের কেন্দ্রীভবনের মত সমস্যাই বাংলাদেশের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ। অধিকাংশ ভারতীয় জানেন না, যে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা নির্মাণে আওয়ামী লীগের কোনো ভূমিকা নেই। তারা বরং মুক্তিযুদ্ধের যা ক্ষতি করেছে, তা আর কেউ করেনি। মুক্তিযুদ্ধের নাম করে জনগণের উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছে আওয়ামী লীগ। এর ফলে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আকর্ষণ কমেছে। আওয়ামী লীগের কারণেই মুক্তিযুদ্ধের প্রতি জনগণের একাংশের বীতরাগ তৈরি হয়েছে।

আওয়ামী লীগ চলে গেলেই বিএনপি, জামাত চলে আসবে— এমন ভাবনা সঠিক নয়। জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক বিকল্প যে তৈরি হতে পারে, এই গণঅভ্যুত্থান তার প্রমাণ। আওয়ামী লীগের আমলে যা বিরোধিতা হয়েছে, প্রতিরোধ হয়েছে, সেখানে বিএনপি, জামাত কী ভূমিকা পালন করেছে? নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন থেকে কোটা সংস্কার আন্দোলন – জনগণই ছিল কেন্দ্রীয় ভূমিকায়। এবারের গণঅভ্যুত্থানেও তাই।

মুক্তিযুদ্ধ কারা করেছেন? এই দেশের সাধারণ মানুষ। কজন আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন? তাঁরা ছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ে। এই দেশের মানুষ বুকের রক্ত ঢেলে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। দেশ স্বাধীন করেছেন। তাই আমি বারবার করে বলি, মুক্তিযুদ্ধকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধকে জনগণের হাতে নিয়ে আসতে হবে।"

আনু মুহম্মদ